সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩৩তম সংখ্যা

চৈত্র ১৪২১ (এপ্রিল ২০১৫)

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষ দরজায় আগত। নববর্ষ স্বাগত। মানুষের মঙ্গল হোক, সমাজ দুরাচার মুক্ত - শান্তির আধার হোক। নববর্ষের এই প্রার্থনা এবং আশা। সমিতির পক্ষ থেকে সকল বাঙালি পরিবার এবং তাদের প্রতিবেশীদের মঙ্গল হোক এই একান্ত কামনা। সমস্ত বাংলা ভাষী মানুষকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সমন্বয়ের বয়স এক বছর পড়ল। আজ থেকে পনেরো বছর আগে এই সময় সমন্বয়ের পরিকল্পনা হয়েছিল। এর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কলেবর বেশি বড় না হলেও, অনুগত মান সেই দিনও কম ছিল না।

যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে লেখা দিয়ে সমন্বয়ের মান এবং যশ বাড়িয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আজ সমন্বয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে আনন্দ পাচ্ছেন।

সমন্বয় - নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। রাজনৈতিক প্রভাবিত ছাড়া সবরকমের লেখা এতে অতীতে ছাপা হয়েছে, ভবিষ্যতেও ছাপা হবে। সমিতির সমস্ত সদস্য এবং সুহৃদ ব্যক্তিকে লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের সমিতি সদস্য এবং শুভাকাঙ্খীদের সব রকমের সংবাদ আদান প্রদান হয়ে থাকে। সমন্বয়ের অস্তিত্ব নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনে অস্তিত্বর সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সমিতির উন্নতি ও বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই সমন্বয়ের উন্নতি ও বিস্তার। আসুন সকল সদস্য এবং শুভাকাঙ্খী মিলে এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আরো সফল করার চেষ্টা করা যাক্।

সঙ্ঘবার্তা

শীতের থরথরি কাঁপুনির থেকে যখন সবাই মুক্তি পেতে অধীর... শীতের সকালের আলসেমী ভেঙেলেপ ছেড়ে ওঠা - গরম জলের জন্য চেঁচামেচি, সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। শুকনো গাছের নেড়া ডালগুলোতে নতুন পাতা ফুটতে শুরু করেছে। পলাশগাছ রাঙা হয়ে ওঠে তার সিঁদুর রাঙ্গা ফুলে । কোকিলের কুহতানে ভোরের আকাশে যেন ফুটে ওঠে বসন্তের আগমন। আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণ শোভিত হয়ে ওঠে রঙবেরঙের Crysenthenum আর ডালিয়া ফুলের সমারোহে। তারই সঙ্গে মিলে থাকে হলুদ গাঁদা ফুলের গোছা । ঠিক তখনই মনে হয় এবার ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পরার সময় প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মিশিয়ে তার আনন্দ লুফে নেওয়া। তাই বোধহয় শীতের শেষ বেলায় শুরু হয় চড়ুইভাতি।

অন্যান্য বছরের মত আমাদের সঙেঘর সদস্যরা মিলিত হয়েছিল চড়ুইভাতি অনুষ্ঠানের আনন্দ নিতে গাজিয়াবাদে এক বাগান বাড়িতে। ঘরেতে ঝিমিয়ে থাকা মানুষগুলো নতুন উদ্যমে মেতে ওঠে নতুন উৎসাহে। সকলের মিলিত আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আমাদের সঙেঘর নতুন কার্যক্রম শুরু হয়।

নতুন বছরের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল বাগদেবীর আরাধনা। শীতের আমেজ কাটিয়ে যুব সম্প্রদায় সমবেত হয়েছিল বাগদেবীর আরাধনায়, আমাদের সঙেঘর সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আরাধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করে । সারাদিন পূজার্চ্চনার পর ভোগেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সান্ধ্যবাসরে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এরই মধ্যে সদস্যদের প্রচেষ্টায় মন্দির প্রাঙ্গণে পালিত হয় পৌষমেলা উৎসব। সমস্ত দিন ধরে বিভিন্ন মনমাতানো কার্যক্রমে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মানুষের সরগমে প্রাজ্ঞল হয়ে উঠেছিল। নয়ডার বিভিন্ন পূজা সমিতিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পৌষমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

এরপরই দোল উৎসব। রঙের মাধুরীতে মেতে ওঠা সদস্যরা । মন্দির প্রাঙ্গণে একে অপরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিল। বাঙালির কোনো উৎসবই ভোজন ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, আমাদেরই সঙেঘর সহ-সভাপতি নিলাদ্রী দুয়ারির স্বতঃস্ফুর্ত আয়োজনে সঙেঘর সদস্য তাঁরই বাড়িতে মিলিত হয়েছিল মধ্যাহ্নভোজে। জীভে জল আনা রসালো ব্যাঞ্জনে ভরা ছিল এই ভোজন ব্যবস্থা।

আমাদের সঙঘ এত উৎসবের মধ্যেও তার সামাজিক দায়িত্ব ভুলতে পারেনি। সুসংঘবদ্ধভাবে আয়োজিত হয়েছিল রক্তদান শিবির্। অনেক মানুষ স্বানন্দে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল 'আধার কার্ড' নথীভুক্ত করা। সদস্যদের সুবিধার জন্য এবং এই প্রয়োজনীয় কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য সঙেঘর সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছিল।

সমস্ত সদস্যদের প্রতি তিনমাস ব্যবধানে আমরা এই সঙঘবার্তা দিয়ে থাকি। এই সময় কালের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল বাসন্তীপূজা। তিনদিন ব্যাপী এই পূজার অনুষ্ঠান। বলা হয় এটাই আসল দুর্গাপজা। দানব মহারাজ রাবণ মা দুর্গার আরাধনায় নিজের শক্তিলাভে এই উৎসবের আয়োজন করেন। যে শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, সেই উৎসব আসলে 'অকালবোধন'। সকল সদস্য এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করে। দুর্গানবমীর দিন মায়ের কাছে সার্বজনিক ভোগ নিবেদন করা হয়। সাধারণ মানুষও এই দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে মায়ের ভোগ আস্বাদন করে।

সকল সদস্যর এবং সর্বসাধারণের কুশল কামনা করে আমরা এবারের মতো ইতি টানছি। এই সঙ্গে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান বর্ষবরণ এবং কবিগুরুর জন্মোৎসব পালনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান কামনায়।

হোলি

সনাতন মুখার্জী

শীতের রুক্ষতা জড়তা অলসতা কাটিয়ে আসে বসন্তের আগমন। বসন্তমানেই হোলি উৎসব। হোলি হল রঙের খেলা। প্রকৃতিও নানা বাহারী ফুলের সমারোহে সৌন্দর্য্যমুখর হয়ে উঠে। মানুষও তাই প্রকৃতির ফুলের রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে চায়। খুশিতে খুশি মিলিয়ে নিজেকে বিকশিত করতে চায়। এতে শরীর ও মন সবই তাজা হয়ে উঠে।

এই রঙের অনেক কথা। এক একটি রঙ এক এক গ্রহের প্রতীক। গ্রহের ফেরে অনেক কিছুই ঘটে। গ্রহদের মধ্যে রবিগ্রহের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। জীবনকে জীবনীশক্তি দান করতে পারে রবিগ্রহ। তার প্রতীক লাল রঙ। সেইজন্য লাল রঙ এত বেশি ব্যবহার হয়।

এই রঙ যখন একে অন্যকে দেয়, তখন তার অজান্তে রঙ দান হয়ে যায়। একে অন্যের সঙ্গে মনের মিল ঘটে। পুরানো দুঃখের অবসান হয়। পুরানো দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে নতুন করে আবার সবকিছু সুন্দর হয়ে উঠুক ইহাই কামনা।

হোলিকা দহন তারই প্রতিরূপ। "বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুর।" যা কিছু অশুভ, অমঙ্গলকারক তাহা দূর করে যা কিছু শুভ ও মঙ্গলজনক তাহাই আমাদের দান করুন। পৌরাণিক কাহানীতে হোলিকা হিরণ্যকশিপুর বোন। যখন ভক্তপ্রহ্লাদকে কোনরূপে পরাস্ত করা যাচ্ছিল না। বার বারচেষ্টা করা সত্ত্বেও ভক্তপ্রহ্লাদকে মারা যাচ্ছিল না। সেই সময় হিরণ্যকশিপু বোন হোলিকাকে স্মরণ করেন। হোলিকা তপস্যা করে অগ্নিদেবের কাছে বর পেয়েছিলেন তার স্পর্শে অন্য সকলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু হোলিকা নিজে পুড়বে না। তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হল প্রহ্লাদকে মারার জন্য। এদিকে দেবতাদের আসন টলল। ভক্তের রক্ষা করার দায়িত্বতো ভগবানের। অগ্নিদেব হোলিকাকে বোঝালেন তাকে বর দেওয়া আছে সত্য কিন্তু সেটা ভক্তদের বিনাশের জন্য নয়। কিন্তু অগ্নিদেব হোলিকাকে বিরত করতে পারলেন না, পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে অগ্নিদেবকে আহ্বান করলেন। সেই অগ্নিতে হোলিকা নিজেই দগ্ধ হয়ে গেলেন। ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে বেঁচে গেলেন।

সেই থেকে প্রতি বছর হোলিকা দহনরূপ অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হচ্ছে। এটি হল অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির আবির্ভাব। নব বসন্তে সবার জীবন শুভময় হোক।

পুরোনো কলকাতার বিস্মৃতির স্মৃতি

(সংকলিত জ্ঞান আহরণ)

কলকাতার জন্মকাহিনী এক বিচিত্র্য গৌরবান্বিত অধ্যায়। রূপসী নগরী আজকের কলকাতা-তিলোত্তমা কলকাতা, আলোর ঝলমলানিতে রাতের কলকাতাকে আজ দেখলে মনে হয় এক যুবতী লাস্যময়ী নারী, বিভিন্ন বর্ণে ছন্দে মাতিয়ে রেখেছে তার প্রেমাস্পদকে - রাত্রির নীরবতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে তার প্রাণ চাঞ্চল্য।

কিন্তু একদিন এই কলকাতা ছিল অন্ধকারে ঘেরা জল-জঙ্গল। গঙ্গা নদীর (স্থানীয় নাম হুগলী নদী) অববাহিকায় জমে যাওয়া পলিমাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল একটি ছোট গ্রাম, বলা হত 'ডিহি কলকাতা'। নদীর স্রোত এঁকে বেঁকে জলজঙ্গলকে ভেদ করে বয়ে গিয়েছে। এই স্থানটা ছিল লুটেরাদের অঞ্চল। অদূর মাঝদরিয়া থেকে কোনো বাণিজ্যিক ফেরীকে ধাওয়া করে নিয়ে আসা হত এই জলজঙ্গলে, তার সম্পদ লুট করার জন্য, আর ছিল মাছুয়ারেদের বস্তী, ওদেরসাথে মিলিয়ে ছিল বন্য জানোয়ার আর বিষধর সাপেদের আস্তানা। এর উত্তরে হুগলী নদীর পার ধরেই ছিল সুতানুটি গ্রাম - সালকিয়া গ্রাম- চীৎপুর গ্রাম।

ঐতিহাসিকেরা বলেন মুঘল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী রাজা মানসিংহ ডিহি কলকাতার সংলগ্ন নয়টি পরগণার ভাগীদারী (খাজনা আদায়ের অধিকার) লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলি নামে এক সম্ভ্রান্ত বাঙালিকে দান করেন এবং তাঁকে 'রায় ও চৌধুরী' উপাধীতে ভূষিত করেন। তিনিই হলেন বর্তমান কলকাতার জনক। কালক্রমে তাঁর পরিবারের সদস্যরা খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য জল জঙ্গলের এক অংশ পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেন। এই অঞ্চলের বর্তমান নাম বড়িষা। লক্ষ্মীকান্তর উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবার নামেই খ্যাতি হয়েছেন ১৬১০ সালে এখানেই আটচালা নির্মাণ করে মা দুর্গার প্রথম আহ্বান করা হয়।

১৬৯৮ সালে জব চার্ণকের জামাই চার্লস আয়ার সুতানুটির জমিদার বিদ্যাধর রায়চৌধুরীকে এ অঞ্চলটি ক্রয় করার অভিপ্রায় জানান । এর আগে ১৬৯০ সালে জব চার্ণক এই সুতানুটিতেই স্থায়ীভাব বসবাসের জন্য আসেন এবং এখনেই তিনি তাঁর দেহরক্ষা করেন, এই সুতানুটি আদিনাম ছিল সুতানুতা, কারণ এখানে তুলা থেকে সুতা তৈরি হত এবং সুতা পাকিয়ে এখানেই জমা করা হত। জবচার্ণক মনে-জ্ঞানে ছিলেন ব্যবসাদার । কলকাতা সুতানুটি, গোবিন্দপুরের জলজঙ্গল তাঁকে মোহিত করে, তিনি এর বাণিজ্যিক উপযোগিতা অনুভব করেন, ওই সময় আর্মেনিয়ান এবং পর্তুগীজদেরও ব্যবসায়িক কারণে এই অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। যদিও বিদ্যাধর চার্লস-এর প্রস্তাব মানে না, কিন্তু চার্লস সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে বিদ্যাধরের বিরুদ্ধে ফরমান আনিয়ে নেন এবং একটি চুক্তি মারফৎ ১৬৯৮ সালে এই তিনটি গ্রাম মাসিক ইজারায় নিয়ে নেন ১৭৫৭ সাল অবধি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই ইজারা বাবদ মাসিক মাসোহারা দিত। মগ জলদস্যুদের রুখবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তিনশো ফুট লম্বা এক পরিখা খনন করে। যার নাম ছিল Marhatta Ditch এই ভাবেই সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেন।

মগ জলদস্যুরা অবশ্য এই জলপথে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে আসেনি। এই জলপথ দিয়ে তখন ইংরেজদের বাণিজ্য বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমের দেশের সাথে জমিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ১৭১২ সালে নিজেদের সুরক্ষাকল্পে ইংরেজ কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কাজ সম্পূর্ণ করে। এই সাথে নিজেদের জনবল এবং সেনাবল বাড়িয়ে নেয় ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্যা এই মারাঠা ডিচ দিয়েই ইংরজে তালুকে ঢুকে পড়ে এবং গণহত্যা ও প্রচুর লুঠতরাজ চালায়। এরই প্রতিশোধ নিতে তদানিন্তন ইংরেজ গভর্নর লর্ড ক্লাইভ নিজের সেনাবল নিয়ে প্রতি আক্রাণ করে। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাদল পর্যুদস্ত হয় । এই যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলাদেশে ইংরেজ সুদৃঢ়ভাবে তাদের স্থায়িত্ব কায়েম করে এবং কলকাতাকেই রাজধানী বানানো হয়। Marhatta Ditch বন্ধ হয়ে যায় সেই স্থান সহরের নর্দমার জল এবং আবর্জনা ফেলার স্থান তৈরি করা হয়। এই তিনটি গ্রামকে সংযোগ করার জন্য রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বিশাল আর্থিক প্রয়োজনে গঠিত হয় 'লটারি কমিশন'। ছোট ছোট খাল বিল ভরাট করার কাজ শুরু হয়। Marthatta Ditch বুঝিয়ে তৈরি হয় বাগবাজার শ্যামবাজার স্ট্র্যান্ড রোড - কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েললি স্ট্রীট ইত্যাদি। শহরের শোভা বাড়ানোর জন্য ছোট ছোট জলাধার উন্নয়ন করে তৈরি হল কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার (বর্তমান নাম হেদুয়া) কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, Calcutta Swimming Club, লাল দীঘি, গোল দীঘি।

গোবিন্দপুর গ্রামেও উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। গঙ্গার (বর্তমান নাম হুগলী) পশ্চিম কুল ধরে এক বিরাট দূর্গ নির্মাণ তৈরি হবার পর তার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল জঙ্গল আর ধান জমি। গোবিন্দপুরের লাগোয়া তিনটি পরগণা চৌরঙ্গি বীরজি এবং কলিম্বা, এই জমির উপর দিয়ে ছিল একাট খোলা নালা। ইংরেজরা কলকাতা শহর উন্নয়ন কল্পে একদিকে যেমন মাটি ভরাট করে স্থলভূমি শক্ত করার কাজ শুরু করে আবার অন্যদিকে ভূগর্ভে

নিষ্কাষণ ব্যবস্থা পাকা করার কাজও শুরু হয়। Underground Drainage System-এর কাজ সম্পন্ন করতে ১৬ বছর লেগে যায়। ১৮৫৮ সালে চৌরঙ্গীর খোলা নালা বুজিয়ে সৃষ্ট হয় চৌরঙ্গীর জনপদ। এই সঙ্গেই নির্মিত হয় পার্ক স্ট্রীট - থিয়েটার রোড সংলগ্ন বিভিন্ন সড়ক। এইভাবেই কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন শুরু হয়।

লালদীঘি

কলকাতার লালদীঘি আজ ইতিহাসে মিশে গেছে। এই দীঘিটি ছিল কলকাতার বুকে এক বিরাট জলাশয়, আজ যে অঞ্চলটির নাম বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (বি.বি.ডি বাগ) । ওই অঞ্চলটির নাম আগে ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার — তারও আগে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার।

জব চার্ণকের কলকাতায় আসার আগেও এই লালদীঘি ছিল। শোনা যায় এখানে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের একটি কাছারি ছিল এবং তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামরাই-এর একটি মন্দির ছিল। দোলযাত্রার সময় এখানে খুব ধুমধাম করে রঙ খেলা হত সেই লালরঙে এই পুকুরটির (দীঘি) জল লাল হয়ে যেত এবং অনেকদিন থাকত, সেই থেকে এর নাম হয়ে যায় 'লালদীঘি'। আবার কিছু লোক বলেন যে মুঘলদের লালদূর্গে যখন সূর্যের আলো পড়ত, সেই রোশনাই এই দীঘির জলে ছায়া ফেললে লা রঙ দেখাত, সেই থেকে এই দীঘির নাম 'লালদীঘি'। আবার কেউ বলেন, প্রখ্যাত বাঙালি ব্যবসায়ী লালচাঁদ বসাক এই দীঘিটি খনন করেছিলেন। তাঁর নামেই দীঘিটির নাম হয় লালদীঘি।

এই লালদীঘি একসময় একটি দুর্গন্ধময় খাদ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এই দীঘিটিকে চওড়া করা হয় এবং দুর্গন্ধমুক্ত করে একটি পরিচ্ছন্ন জলাধার তৈরি করা হয়। কলকাতা শহরের বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্য এই সরোবর থেকেই মিষ্টিজল সরবরাহ করা হত। পরবর্তীকালে এই লালদীঘিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসক গড়ে তোলে এক ব্যবসায়িক কেন্দ্র। যার নাম দেওয়া হয় ডালহৌসী স্কোয়ার। সময়ের সাথে সাথে এই দীঘিটির কলেবর ছোট হয়ে যায়। এই দিঘীর একটি অংশ বুঝিয়ে নির্ম্মিত হয় বহুতল টেলিফেন ভবন এবং অন্যান্য অফিস, ভারত সরকার এই অঞ্চলটির নাম পরিবর্তন করে রাখে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ্ (বি.বি.ডি. বাগ)। লালদীঘির নিজস্বতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় ইতিহাসের অন্তরালে।

চাঁদপাল ঘাট

গঙ্গার বুকে একটি অতি প্রাচীন ঘাট এই চাঁদপাল ঘাট। কোনো এক সময় চন্দ্রপাল নামে এক ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের কোনো এক অজানা স্থান থেকে উপার্জনের আশায় গঙ্গার এই ঘাটে একটি পানের দোকান দিয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের পানের খিলি তৈরি করে সে মানুষের মনোরঞ্জন করত। গঙ্গার ঘাট ভ্রমণকারীরা চলার পথে জড় হতেন এই দোকানের সামনে। সাহেব পাড়ার লোকেরাও আসত । চন্দ্রপালের সাজানো পানের খিলি মুখে দিয়ে সকলেই খুব মজা পেত। চন্দ্রপালের সাজানো পানের মধুরতা সকলকে এতই প্রসন্ন করে যে ঐ অঞ্চলের ইংরেজ প্রধান গঙ্গার ওই ঘাটের নামকরণ করেন চন্দ্রপাল ঘাট। এই ভাবেই গঙ্গার এই ঘাটটি সকল মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কালের গতিতে এই নামটি অপভ্রংশ হয়ে ঘাটটি পরিচিত হয় চাঁদপাল ঘাট নামে।

বাবুঘাট

গ্রীক্ স্থাপত্যে নির্মিত গঙ্গার পাড়ে বাবুঘাট একটি প্রাচীনতম ঘাট। ১৮৩০ সালে ঘাটটি নির্মিত হয়। এই ঘাটটির আসল নাম ছিল বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট। ইনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধেয়া রাণী রাসমণির স্বামী এবং জানবাজারের জমিদার। কালক্রমে নামটি ছোট হয়ে প্রচলিত হয় বাবুঘাট।

ডেকার্স লেন

ওয়াটার লু স্ট্রীট থেকে যে রাস্তাটি বেরিয়ে এসপ্লানেড রোডে গিয়ে মিশেছে, তার নাম ডেকার্স লেন। এই রাস্তাটিকে আগে বলা হত টিফিন গলি, বিভিন্ন দেশ থেকে যে নাবিকেরা কলকাতায় আসত তারা এখানেই জমায়েত হত । বিভিন্ন ধরণের খাবার স্টল রাস্তার দুধারে ছিল। আর ছিল চিত্তদার দোকান। মাংসের stew আর পাউরুটি টোস্ট খেতে এখানে ভীড় হত। ২০০ বছর ধরে এই রাস্তায় খাদ্যরসিকের ভীড় জমেছিল দেশ-বিদেশের রসনাব্যাঞ্জনের স্বাদ নিতে। এই রাস্তাটিকে বলা হত কলকাতার 'Mecca of Street Food.'

আমহার্স্ট স্ট্রীট

আমহার্স্ট স্ট্রীট রাস্তাটির পুরোনো নাম ছিল Alms House Street. ভিখারিদের রাস্তা। বাঙালি ব্যবসায়ী মতিলাল শীল ১৮৪০ সালে এখানে একটি Alms House নির্মাণ করেছিলেন। এখানে প্রতিদিন, প্রায় পাঁচশ ভিখিরিকে খাওয়ানো হত। এই রাস্তাতেই রাজা রামমোহন রায় থাকতেন। আজ তাঁরই নামে এই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

কলকাতার একটি অতি পরিচিত রাস্তা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্র সরণীতে গিয়ে মিশেছে এই রাস্তাটি পুরোনো কলকাতার খুবখারাপ রাস্তা ছিল। এর নাম ছিল কসাইতলা স্ট্রীট।

কারণ এই রাস্তার উপর গরু-ছাগল কাটা হত। আর কসাইরা এখানেই থাকত। সমস্ত রাস্তায় মাংসের হাড় পড়ে থাকত আর লাল রক্তে মাখা থাকত, দুর্গন্ধে ভরা থাকত এই অঞ্চল। কোন হিন্দু কালিঘাট মন্দিরে যেতে গেলে অনেক ঘুরে যেত। ১৮৭৬ সালে সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর নামে রাস্তার নতুন নামকরণ হয়।

হলওয়েল মনুমেন্ট

আজকের প্রজন্মের অনেকেই জানে না পুরোনো কলকাতার এই স্মারকটিকে। এই স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৭৬০ সালে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। এই স্তম্ভটি নির্মাণ করেন সালে ইংরেজদের পুরোনো কেল্লার এক গভর্নর জন হলওয়েল। ইংরেজরা মগ্ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গঙ্গার বক্ষে এক বিরাট পরিখা খনন করে দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু সেই জলপথ দিয়েই ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ইংরেজদের বিতাড়িত করেন, পুরোনো দুর্গে নিরাপত্তারক্ষীদের একটি ঘরে ১২০ জন ইংরেজ সৈনিককে বন্ধ করে রাখা হয়। সেখানেই তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। একে ইংরেজরা অন্ধকূপ হত্যা নামে অভিহিত করে এবং এই ঘরটি "Black Holes" নামে প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে এই মৃত সৈনিকদের স্মরণে জেনারেল হলওয়েল একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যেটি 'হলওয়েল মনুমেন্ট' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। ইংরেজদের এই দুর্দশা কাটাতে এরপর লর্ড ক্লাইভ গভর্নর হয়ে আসেন। ১৭৫৭ সালে, পলাশীর যুদ্ধে তিনি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে পরাস্ত করেন। কিছু স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায়। এরপর ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ামস্ দুর্গ নতুন করে আরও সুদৃঢ় করে নির্মাণ করে বর্তমান কলকাতার ময়দান অঞ্চলে। লর্ড কার্জন এই স্তম্ভটি ১৯০১ সালে সরিয়ে বর্তমান ডালহৌসী স্কোয়ার-এর এককোণে যেখানে পুরোনো দুর্গের black hole কথাটি ছিল, সেখানেই নতুন করে স্থাপন করেন। এই স্তম্ভটি অপসারণের জন্য নেতাজী সুভাষ বোস এক ঘোরতর আন্দোলন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪০ সালে এই স্তম্ভটি অপসারিত হয় এবং সেন্ট জনস্-এর গির্জ্জার উদ্যানে স্তম্ভটিকে নতুন করে স্থাপন করা হয়, যা আজও সেখানে অবস্থিত আছে।

এক নিস্তব্ধ দুপুরে

রিঙ্গি সেন

গ্রীষ্মের এক নিস্তব্ধ নির্জনে দ্বিপ্রহর
সামনে টিনের চালা দেওয়া
একটা ছোট্টা মাটির ঘর,
ঘরের একদিকে শাখাপ্রশাখা মেলে
দাঁড়িয়ে এক বিরাট বটগাছ
অন্যদিকে আগাছাভরা জঙ্গলের মাঝে
একটা ছোট পুকুর ঘাট।
চারিদিকে ঘন-নির্ঝনতা।
মাঝে মাঝে টুপটাপ করে উড়ে পড়ছে
বটের শুকনো ঝরাপাতা।
গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্যের প্রখর উত্তাপ,
দূর থেকে কানে-ভেসে আসছে
কোন এক ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক।
কিছুটা দূরেই একটা আমবাগান
গাছে গাছে এসেছে কতো আম,
বড়ো একটা আমগাছের ছায়ায়
ছোট এক বাঁশের মাচায়
বাগান পাহারা বসে আছে
গ্রামেরই রহিম চাচা।
বাগানের পাশে মেঠো পথ ধরে
একপাল গরু সঙ্গে করে
লাঠি হাতে চলেছে রাখাল ছেলে
একমনে বাজিয়ে চলেছে বাঁশি
সুমধুর এক ভাটিালী গানের সুরে।
বাঁশির সুরে মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে
চোখের পাতা অলসতায় বুজে আসে
শুধুমাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া
আর যেন কিছু নেই চারপাশে।

না থামা বৃষ্টি

তরুণ চক্রবর্তী

বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়,
বৃষ্টি পড়ে ভুঁয়ে।
বৃষ্টি পড়ে, মাথার উপর
পুরোন ছাদ চুঁয়ে।
বৃষ্টি পড়ে মাঠে মাঠে,
ভেজে ছেলে বেলা।
বৃষ্টি পড়ে গ্রামে গ্রামে,
ভাসে কলার ভেলা।
বৃষ্টি ভেজা জোয়ার জলে
ইলিশ মাছেল ঢল,
পানসি নিয়ে ভেসে বেড়ায়
পরান মাঝির দল।
বৃষ্টি আনে ভালোবাসা
বৃষ্টি ভেজায় হিয়া,
ঘন বাদল যায় উড়ে যায়
মনের খবর নিয়া।।

মানসী

মালা দেব

বর্ষা দিনের একাকী মনে ধরা দিল সে যে।
মেঘলা বরণ কালো কেশে, সবুজঘন সাজে।
জলের ফোঁটা গড়িয়ে ছিল নিটোল গ্রীবা তলে,
আবছা আলো ছড়িয়ে যেন কপোট পলক দলে।

হাতে ছিল বকুল মালা, মাথে চাঁপার ফুল।
কানে গোঁজা শুভ্র টগর, গলে বেলের ঝুল
মোহিত মনে, নিথর দেহে স্বপ্ন হেরে ছিনু,
স্বপ্ন যেন সত্যি না হয় বললে রামধনু।।

একটু সাহস লাগে ভাই

উদয়ারুণ রায়

ফুলের বাজারে সার সার ফুলের দোকান
চেনা জানা বহু উপমায় বহু বাহবায়
অজস্র পার্টিতে, উৎসবে অথবা উৎসাহে ব্যবহৃত
গুটিকয় পরিচিত ফুল কোঠা বাড়ির মেয়েদের মতো
নিজেদের ক্লান্ত সৌরভে সুসজ্জিত হয়ে সার বেঁধে
সেল্‌ফে বসানো আছে আরও বহুবার ব্যবহৃত
কিংবা বিনিময়ে হাতবদল হবে বলে।

অথচ পাড়ার জঙ্গলে কাঁটা ঝোপে যে ফুল দেখছি প্রতিদিন
সাঁওতাল মেয়েদের খোঁপা জুড়ে যে ফুল গোছা দেখেছি বাঁকুড়ায়
ধামাল মাদলের তালে তালে যারা সব হেসে হেসে লুটোপুটি খায়
কুমায়ুন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, নন্দন কাননের বিস্তীর্ণ চত্বরে
অজানা অচেনা যে ফুল দেখেছি আমি।
যে ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্য অস্বীকৃত। সেই সব ফুল —
আমাদের পরিচিত বাজারে কোনোদিন বিকোবে না। কদর পাবে না
কোনোদিন।

যে সব ফুলের রূপ দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি
যারা আমাদের আর মোহিত করে না
সেই ফুল বাজারে বিকোয় খুব বেশি! তাতেই রোজগার।
নতুনকে এনে ঝুঁকি কে নিতে চায় বলো?
কিছু ফুল ব্রান্ড হয়ে গেছে বিশেষ কিছুর আয়োজনে।
আমাদের সৌন্দর্যবোধ গড্ডালিকা স্রোতে বাদ পড়ে গেছে বহুদিন।
আমাদের জীবনবোধ সমাজের প্রতি বাঁকে
একইভাবে পরিদৃশ্যমান। একঘেয়ে, ক্লিশে।
দু-চোখেই ঠুলির চশমা। দু-পাশে তাকাতে ভুলে গেছি।
নতুনকে স্বাগত জানাতে বড়ো ভয়। ঈর্ষা। পতনের ভয়।
গেঁড়ে বসা আমারা ভয় পাই খুব। এর বুঝি পা পিছলে গেল।

অথচ যদি সামান্য দুঃসাহসী হতে পারা যেত
নিশ্চিত সাধুবাদ ছেড়ে নতুনের সন্ধানী হতো
তবে দেখা যেত এখনও ভালোর দাম দুর্মূল্যই আছে।

তাই বলি ব্রাদার,
নতুন কোনো অসাধারণকে বাহবা দিতে একটু সাহস লাগে ভাই।

স্বীকৃতি

বিপ্লব দাশগুপ্ত

পাখীরা - কালো দোহারা চেহারার একটি আদিবাসী ছেলে। এখন বয়স হবে প্রায় পনেরো বছর। খুবই শান্তশিষ্ট ছেলে। সুধাংশু সরকারের বাড়িতে কাজ করছে প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেল। সুধাংশুবাবু PWD-র কাজে পুরুলিয়াতে ছিলেন বেশ কিছুদিন প্রায় বছর দশেক হবে। ওনার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মই হয় পুরুলিয়াতে। ওইখানেই একদিন পাখীরার বাবা ওকে নিয়ে এসেছিল সুধাংশু বাবুর বাড়িতে। ওরা খুব গরীব ছিল -পুরুলিয়ার কোন প্রত্যন্ত গ্রামে থাকত। ওরা রাস্তা নির্মাণ কাজে মজুরী করত। পাখীরার তখন বয়স হবে পাঁচ কি ছয়। বাচ্চা ছেলে কিন্তু খুবই চঞ্চল। ওর বাবার অনুরোধ ছিল যে যদি পাখীরাকে সুধাংশু বাবু রাস্তা নির্মাণ কাজের মজুর করে নেন।

সুধাংশুবাবুর ছেলেটিকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সে দিন মজুরের কাজে ওকে নিতে কিছুতেই তাঁর মন চাইছিল না। ওর বাবাকে তাই বলল, 'এখন তো ওর পড়াশুনা করার বয়স! এখন থেকেই কেন মজুরের কথা ভাবছ?' ওনারকথা শুনে পাখীরার বাবার মনটা দমে গেছিল, বড় আশা নিয়ে এসেছিল সে। একটু গদগদ ভাবে সে বলে উঠল, 'হুকুম, আমরা গরীব ঘরের বটে! আমার পাঁচটা ছাওয়াল ঘরে, এতগুলান পেট ভরানের পয়সা কুথায়? ও তৃতীয়জন কিন্তু যমজ বটে। ওর সাথে একটা বিটি আছে.... আপনি কহেন হুকুম ... আমি কি করি?' কথাটা বলতে বলতে নিরাশ চোখে সুধাংশু বাবুর দিকে তাকিয়েছিল। সুধাংশু বাবুরও মায়া ধরেছিল। কিন্তু এত অল্পবয়সী ছেলেকে কাজে লাগানো আইন বিরুদ্ধ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাঁর মাথায় একটা planএল। খুবই ইতস্তত করে সেদিন সুধাংশুবাবু একটি প্রস্তাব রেখেছিল পাখীরার বাবার কাছে।

'দ্যাখ এটা পরিষ্কার যে আমি তোমার ছেলেকে দিনমজুরের কাজে লাগাতে পারব না।' কথাটা শেষ করতে দেয়নি সুধাংশুবাবুকে, পাখীরার বাবার চোখে জল এসে গেছিল। সে বলে উঠল, 'হুকুম আমরা মুখ্যু মানুষ বটে, কিন্তু একটা বিচার করা চাই।' সুধাংশুবাবু পাখীরার বাবাকে শান্তভাবে বসিয়ে বলল, 'তুমি কি তোমার ছেলেকে আমার কাছে দেবে?' কথাটা শুনে এক লহমায় পাখীরার বাবা বলে উঠল ঃ আপনি নিয়া ন্যান, হুকুম, ও বেঁচে যাবে।' সুধাংশুবাবু আবার ওকে থামিয়ে বলল, 'ভাল করে ভেবে বলবে। আমার বাড়িতে আমার দুই ছেলে আছে, তাদেরই সাথে ও থাকবে। ওকে আমি অন্যভাবে বড় করতে চাই... ওর সব দায়িত্ব আমার, কিন্তু তুমি কোনো পয়সা কড়ি আশা করবেনা ওর কাছ থেকে। আর যতক্ষণ না ও বড় হচ্ছে তোমরা কেউ দেখা করতে পারবে না।' পাখীরার বাবা যেন খুব উৎসাহ পেল। 'আমি রাজী হুকুম'। সুধাংশুবাবু বলেছিল ঃ না... না... এত সহজ নয় তুমি ওকে নিয়ে এখন বাড়ি যাও... তোমার বউ-এর সাথে আলোচনা কর... মনটাকে ঠিক করে ওকে নিয়ে এস আমার বাড়িতে। আমার তো বদলির চাকরি... কখন চলে যেতে হবে। .....পাখীরাও কিন্তু আমাদের সাথে যাবে। তুমি, যখন ইচ্ছে হবে, আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে... পাখীরার যদি মন লেগে যায় তবে আর আমি ওকে ছাড়ব না।"

এইভাবেই একদিন পাখীরা, ওর ছোট্ট টিনের স্যুটকেশটা নিয়ে সুধাংশুবাবুর পরিবারে সামিল হয়েছিল। পাখীরার কোনো দুঃখ ছিল না ওর পরিবারকে ছেড়ে আসায় । সুধাংশুবাবুর বড় ছেলে জিতেন্দ্রর সাথে জমে গেছিল। প্রায় এক বয়সীই হবে দুজনে। ঘরের টুকিটাকি কাজ, ছোটখাট বাজার - দোকান করার দায়িত্ব ওর উপর ছিল। সুধাংশুবাবু ওকে বুঝিয়েছিল যে পরিবারের সকলকে কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। তবেই সে খাবারপাবে। ভাই জিতু পড়াশুনা করছে সেটাও একটা কাজ। ছোটভাই এখন ছোট বলে ওর কোনো কাজ নেই। সুতরাং পাখীরাও যখন পড়াশুনা করে না তখন ঘরের টুকিটাকি কাজতো তাকে করতেই হবে। পাখীরাও খুব খুশি ছিল। আর শেখারও খুব আগ্রহ ছিল ওর। নিজেই সুধাংশুবাবুর স্ত্রীর সাথে থেকে থেকে সব কাজ শিখে নিচ্ছিল। সুধাংশুবাবুর স্ত্রীকে পাখীরা মা-ই বলত। পাখীরার নিজের পরিবারে বোধহয় এত স্বাধীনতা ছিল না তাই এই নতুন বাড়িতে এসে ওর খুব ভাল লাগল। সুধাংশুবাবুর বাড়িটা একটু বাংলোর মত ছিল। ওখানে একটা ছোট পড়ার ঘর ছিল। সেই ঘরটাই পাখীরাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

পাখীরার একটা অভ্যাস ছিল ছবি আঁকার। দেশের বাড়িতেও খড়ি দিয়ে দাগ কেটে বিভিন্ন স্কেচ বানাতো। লাল ইঁট দিয়ে মেঝেতে কিছু না কিছু আঁকার চেষ্টা করত। পাখীরার এই অভ্যাসটা আবিষ্কার করেছিল সুধাংশু বাবুর বড় ছেলে জিতু। জিতু তখন স্কুলে পড়ে। ওদের ড্রইং ক্লাস হতো স্কুলে। কিন্তু জিতুর অত ধৈর্য ছিল না। কোনো দিনই ও ক্লাসে পুরো স্কেচ করতে পারেনি। ড্রইং বুকে হিজিবিজি এঁকে রাখত। সেবার ওদের ক্লাসে একটা ড্রইং এক্সিবিশন করার পরিকল্পনা হল। জিতুকে বলা হয়েছিল একটা সহজ ছবি আঁকতে রঙ-বেরঙের পেন্সিল দিয়ে। জিতু পাখীরার ঘরে বসে সাদা কাগজে সেই চেষ্টা করে যাচ্ছিল। আসলে পাখীরার থাকার ঘরটা দিনের বেলায় ছিল জিতুর পড়ার ঘর। ওই ঘরেই একপাশে একটা চারপাই পাতা হয়েছিল পাখীরার জন্য । পাখীরা ওর ঘরের কাজকর্ম সেরে যখন জিতুর পড়ার ঘরে এল দেখল জিতু একটা

ছবিআঁকার চেষ্টা করছে কিন্তু হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। পাখীরা অনেক্ষণ দেখার পর জিজ্ঞাসা করল? কি আঁকছিস রে জিতু?' জিতু ওকে সব খুলে বলল। পাখীরারও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছবি আঁকার। অনেক দিন হয়ে গেছে কোনো ছবি আঁকতে পারেনি। তাই লোভ সামলাতে না পেরে বলল 'আমি এঁকে দেব?' ওর কথা শুনে জিতু চমকে উঠল 'তুই আঁকতে পারিস?' পাখীরা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল হ্যাঁ, এবার জিতু ওর খাতা পেন্সিল পাখীরার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল। 'আঁকতো দেখি' । পাখিরা এক মিনিট কিছু ভাবল, তারপর বলল 'যদি খারাপ হয়ে যায়?... তোর খাতা নষ্ট হয়ে যাবে...' ওকে থামিয়ে দিয়ে জিতু বলে উঠল, 'ঠিক আছে... তুই আঁক না... দেখি।' এবার পাখিরা পেন্সিলটা হাতে নিয়ে বলল 'একটা কথা মানতে হবে কিন্তু... তুই কাউকে বলতে পারবি না যে আমি ছবি আঁকতে পারি...। এমনকি বাবু আর মাকেও বলবিনা... আমি তো এখানে ছবি আঁকার জন্য আসিনি।...' জিতু একরকম কসম খেয়ে বলল, যে ও কাউকে বলবেনা । ও দরজাটা বন্ধ করে দিল। আসলে এই সময়টা মা ব্যস্ত থাকে ছোট ভাইকে নিয়ে... আর বাবাতো অফিসে... সুতরাং বিরক্ত করার কেউ নেই। পাখীরা মনে মনে চিন্তা করে নিল ওদের গ্রাম... লাল মাটির রাস্তা... একটা ছোট্ট কুকুর দাঁড়িয়ে রাস্তার একপাশে... মাচা বাঁধা ওদের বাড়ি। সেই মত স্কেচ বানিয়ে ফেলল। খুব ভাল লাগল জিতুর, বলল রঙ পেন্সিল দিবি না? পাখীরা জবাব দিল, 'না ওটা তোকেই করতে হবে... আমি বলে দিচ্ছি। ছবিটা যে তুই এঁকেছিস, সেটাতো প্রমাণ করতে হবে?' কথাটা বলেই রঙপেন্সিলটা জিতুর হাতে ধরিয়ে দিল। লাইন ধরে ধরে লাল পেন্সিল দিয়ে রাস্তাটা এঁকে নিল জিতু। এই ভাবে পুরো ছবিটা রঙ করার পর খুবই সুন্দর রূপনিল। আঁকা হয়ে গেলে খাম বন্ধ করে দুজনেই খেতে চলে গেল। পরের দিন স্কুলে painting exhibition-এ জিতুর আঁকা ছবিটা সকলেরই বেশ নজর টানছিল, সব টিচাররাই ছবিটা দেখে খুব প্রশংসা করছিল, জিতুও মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করছিল, ওর সাথীরা তো ফিস ফিস করে জিতুকে জিজ্ঞাসাই করছিল 'কি রে? কাকে দিয়ে ছবিটা আঁকিয়েছিস রে?... এত ভাল তুই আঁকতে শিখলি কবেথেকে?...' জিতু ওদের কথার কোনো উত্তরই দেয়নি। শুধু বলেছিল, 'আমার মা আঁকতে জানে না।' কিন্তু ওদের Drawing teacher যখন last period-এ এলেন, তিনি ছবিটা অনেকক্ষণ দেখার পর জিতুকে ক্লাসের বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন। জিতুর খুব ভয় করছিল - এবার কি হবে? Drawing teacher খুব ভাল আঁকতে পারেন। তিনি জিতুকে প্রথমে খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'আঁকার হাতটা খুবই ভাল... কিন্তু কিছু কিছু জিনিসের উপর নজর দিতে হবে... নয়তো ভারসাম্য থাকছে না. 'এরপরই জিতুর কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ঠিক করে বলতো, কে এঁকেছে ছবিটা?... তুমি তো নিশ্চয়ই নও।' জিতু একটু সাহস নিয়ে বলল, 'স্যার এইসব রঙ আমিই করেছি।' একটু হেসে টিচার বলল, 'সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।... কিন্তু আগে একটা পেন্সিল স্কেচ করা হয়েছিল, তাতে রঙ বোলানো হয়েছে, পেন্সিল স্কেচ-এর ছাপটা অনেক জায়গাতে দেখা যাচ্ছে। আমি জানতে চাইছি। ওই পেন্সিল স্কেচটা কে করেছে এবার আর লুকোতে পারল না জিতু । ও পাখীরাকে কথা দিয়েছিল যে ওর নাম করবে না, কিন্তু এখন কি করে মিথ্যা কথা বলবে?' একটু আমতা আমতা করে জিতু বলল, 'স্যার আপনি রাগ করবেন না তো?' উনি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলে জিতু বলে উঠল, 'আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে আছে... আমারই বয়সের ... খুব গরীব কিন্তু ভাল আঁকতে পারে... সে-ই স্কেচটা করেছিল ।'জিতুর কথা শুনে ওর টিচার বলে উঠল 'ছেলেটির তো দেখছি ভাল আঁকার হাত আছে। তুমি একদিন ওকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি দেখতে চাই।' এবার একটু ঘাবড়ে গেল জিতু। সে বলে উঠল, 'স্যার ও যে আমাকে বলেছে, কাউকে না জানাতে ও আঁকতে পারে' ওর ভয় আছে যদি বাবা-মা ওকে বকে... ওকে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।.. ওরা খুব গরীব। জিতুর টিচার ওর কথা শুনে একুট ভাবল, কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হয়েছিল যে গরীব ছেলেটি যদি একটা কারো সাহায্য পায়, তবে অনেক ভাল ছবি আঁকতে পারে। শেষকালে জিতুকে বলল, 'ঠিক আছে প্রত্যেক শনিবার আমাদের last classটা হচ্ছে আঁকার। তুমি চেষ্টা করে একদিন ওকে বিকেল বেলা আসতে বোলো, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য, 'জিতু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, ওরা ফিরে এল ক্লাসে, জিতু যেন সেদিনের মত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বাড়িতে এসে খুব আনন্দে সবাইকে ওর আঁকা ছবিটা দেখাল, সুধাংশুবাবু এবং ওনার স্ত্রী খুবই গদগদ হয়েছিল ছবিটা দেখে, সুধাংশু বাবু বলেই ফেলল, 'আমার ধারণাই ছিল না তুমি এত ভাল ছবি আঁকতে শিখেছ।' পাখীরার মুখেও খুব হাসি । নিজের মনে খুব মজা পাচ্ছিল। পরে যখন দুজনে ওদের ঘরে আসল তখন দুজনেই খুশিতে ফেটে পড়ল।

এইরকম ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। পাখীরা সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল। সারাদিন ছুটে ছুটে ওর মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত। জিতু স্কুলে চলে গেলে, ছোট ভাইকে নিয়ে খেলত। চা তৈরি করা - দুধ গরম করা এই সবই ও শিখে গেছিল। জিতু ফিরে এলে ওর খাবারটা গুছিয়ে দিত, তারপর একসাথে দুজনে খেত, বিকেলবেলা খেলতে যেত জিতু, আর পাখীরা ছোটভাইকে Pram-এ করে পার্কে ঘোরাতে নিয়ে যেত। রাত্রিবেলা সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে যখন পাখীরা নিজের ঘরে শুতে যেত তখন কিছুটা সময় ছবি আঁকত। বাবা-মা থাকত না বাড়িতে...

পাড়াপড়শীর বাড়িতে গল্প করতে যেত। ওনাদের বাড়ি না আসা পর্যন্ত কিছুটা সময় নিজের ছিল পাখীরার। ওই সময়েই ছবি আঁকত। জিতুর আঁকার একটা বড় painting book আর coloured pensil set এনে দিয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। জিতুর হলেও এই জিনিসগুলোর দায়িত্বে পাখীরাই ছিল। কেউ জানতে পারত না, পাখীরার ছবি আঁকার কথা। এই সুযোগে পাখীরা অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলল, ওর কল্পনা শক্তি দিয়ে। ওদের গ্রামের ছবি... গ্রামের মেলার ছবি.. ছৌনাচের ছবি... ওদের এই বাড়ির ছবি... এ রকম অনেক ছবি। জিতু ছবিগুলো আঁকা হলেই ওর বাড়িতে দেখাত তারপরস্কুলে নিয়ে গিয়ে ওর টিচারকে দেখাত। জিতুর বাবা-মা জিতুকে নিয়ে নানান চিন্তা করতে লাগল। ওর আঁকা ছবিগুলো পাড়া-পড়শিদেরও দেখাতে লাগল। সকলেই জিতুর আঁকা নিয়ে খুব প্রশংসা করতে লাগল।

এইরকম করেই দিন কাটছিল। একদিন জিতু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বলল, যে স্কুলে ঠিক হয়েছে প্রতি শনিবার, স্কুলের ছুটির পর sports teacher খেলার মাঠে ফুটবল খেলাবেন জিতুকেও থাকতে হবে। কথাটা সত্যি, জিতু কথাটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল। সুধাংশুবাবু ঠিক করলেন যে, জিতুর দুপুরের খাবার টিফিন বক্সে যাবে। ও স্কুলেই কিছু খেয়ে নেবে। আর পাখীরা এই খাবার নিয়ে যাবে। খেলা শেষ হলে ওরা দুজনেই একসঙ্গে ফিরে আসবে। জিতুর স্কুল, বাড়ি থেকে হাঁটাপথেই যাওয়া যায়। পাড়ার অনেকেই ওই স্কুলে পড়ে। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ ছিল না। একদিন সুধাংশুবাবু পাখীরাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবেন, সেইমতই কাজ হল, জিতু মনে মনে ভাবল, এইবার পাখীরাকে স্যর-এর কাছে নিয়ে যেতে পারবে। পাখীরা এ সমস্ত কিছুই জানত না। জিতু দুদিন বিকেলবেলা পাখীরাকে ওর স্কুল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সুধাংশুবাবুও বিকেল বেলা পাখীরার পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং মনে মনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

বহু প্রতিক্ষিত, সেই শনিবার দিনটা এল। জিতু painting book আর colored pensil set ওর ব্যাগেনিয়ে স্কুলে চলে গেল। বিকেল বেলা পাখীরা জিতুর টিফিন বক্স নিয়ে ওর স্কুলে গেল। স্কুল অফিসের সামনে বারান্দায় একটা বেঞ্চে বসে রইল। স্কুল ছুটি হতে জিতু বেরিয়েই পাখীরার কাছে এল। পাখীরা স্কুলে আসতে পারায় মনে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছিল। জিতুর সাথে পৌঁছে গেল school ground এ, স্কুলের সব ছেলেরা খেলছে। ওখানেই একটা shade-এ ওরা বসল। জিতু ওর টিফিনটা খাচ্ছিল, আর পাখীরা বসে বসে চারিদিক দেখছিল। এমন সময় জিতুর drawing teacher সেখানে এল। ওনার হাতে ছিল জিতুর painting book। তিনি সোজা পাখীরাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ছবির স্কেচগুলো কি তুমি করেছ?' কথাটা শুনে পাখীরা চমকে ওঠে। কি উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারে না। ড্রইং টিচার আবার বলে ওঠেন, 'আমি সব শুনেছি, তবু তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।' এবার পাখীরা আর ভাবার সুযোগ পেলনা। মাথাটা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ততক্ষণে জিতুর খাওয়া হয়ে গেছে, Drawing Teacher বলে উঠলেন, 'ওরা এখন ঘন্টা খানেক খেলবে। তুমি আমার সাথে এস।' কথাটা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। ওনার পিছু পিছু পাখীরাও জিতুর সম্মতি নিয়ে এগিয়ে গেল সন্ত্রস্ত পায়ে। পাখীরার মনে বিরাট ভয়, এরপর কি হবে? বাড়িতে বাবা-মা যদি জানতে পারে?... ওকে যদি ওর দেশে পাঠিয়ে দেয়? পাখীরার ভয়টা প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে দিলেন drawing teacher। পাখীরার পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'খুব ভাল তোমার হাত। তুমি আঁকবে আমার কাছে?' কিছুই বলতে পারে না পাখীরা। ওর মনে ভয়। ড্রইং টিচার বুঝতে পারেন ওর মনের অবস্থা। ওকে আস্বাসন দিয়ে বলে ওঠেন, 'তুমি ভয় পেও না, কোনো চিন্তা করো না। তোমার বাড়িতে কেউ জানতে পারবেনা। একমাত্র জিতু ছাড়া... তোমার আঁকা আমার ভাল লেগেছে। তাই তোমারও ড্রইং ক্লাস আমি নিতে চাই।' কথাটা শুনে এবার একটু খুশি হল পাখীরা। মাথাটা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

সেইদিন থেকে পাখীরার জীবনে আর একটা নতুন সুর এল। প্রত্যেক শনিবার জিতুর খাবার নিয়ে ও আসত। তারপর জিতুকে খাইয়ে ও drawing teacher-এর কাছে চলে যেত। ড্রইং টিচার ওর জন্য আলাদা drawing book এনেছিলেন এছাড়া Drawing Canvas-এরও ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই সাথে water paint, oil paint এবং বিভিন্ন তুলিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব দেখে পাখীরা উল্লসিত হয়ে উঠল, মনেতে ভয় ছিল, চুপিচুপি জিতুকে বলেই দিল, 'বাবা-মা জানতে পারলে কি হবে?' জিতু ওকে আস্বাসন দিয়ে রেখেছিল, কোনো ভয় নেই। কেউ জানতে পারবে না, পাখীরার মন এক প্রশান্তিতে ভরে উঠল। পাখীরার মনে পড়ে ওর গ্রামের কথা - লাল মাটির দেশ - কিছু কিছু জায়গা জুড়ে অরণ্য প্রান্তর। কত রকমের পাখী দেখা যায়, ওরা আসে ওই জঙ্গলের মাঝে, ঝিলের ধারে আসে। ওই জঙ্গলে হরিণ আছে ডোরা কাটা হরিণের দল ঘুরে বেড়ায় - বাঁদরের কিচির-মিচির সারাক্ষণ লেগে থাকে, এই সমস্ত দেখতে খুব ভাল লাগত পাখীরার। সে ঘুরে বেড়াত ওই জঙ্গলে ওই ঝিলের ধারে, মাটিতে খড়ি দিয়ে বা ইঁটদিয়ে আঁকতে চেষ্টা করত এক একটি মুহূর্ত। ছবিগুলো সব নিজের মনে ধরে রাখত। এই বাড়িতে এসে প্রথম সে জিতুর painting book-এ কাগজের উপর পেন্সিল স্কেচ

করেছিল। নিজের আঁকা স্কেচ দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন আর কোনো অসুবিধা হয়না কাগজে ছবি আঁকতে, কিন্তু তুলির ব্যবহার সে কিভাবে করবে? জিতুর টিচার বলেছে, তিনি সব দেখিয়ে দেবেন, সেটাই পাখীরার ভরসা। একবার দেখিয়ে দিলে, ও ঠিক শিখে নেবে। একটা নতুন শিহরণ নিয়ে সেদিন পাখীরা জিতুকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল পাখীরার জীবনে। প্রত্যেক শনিবার ও যেত জিতুর স্কুলে। আর সেই সঙ্গে ওর ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ। পুরোনো অভ্যাস মত জিতুর painting book-এ পাখীরা স্কেচ করত, তারপর ওর টিচারের সাথে আলোচনা করে বড় কাগজে আবার তুলি দিয়ে আঁকত। অনেক ভাল ভাল ছবি এঁকেছে পাখীরা। বাড়িতে জিতু ওই ছবিগুলো দেখাত ওর বাবা-মাকে। ওনারাও খুশি হতেন জিতুর আঁকা দেখে। এইভাবেই জিতু উপরের ক্লাসে উঠে এল। এখন প্রতিদিনই জিতুর খাবার নিয়ে পাখীরা যেত। যখনই সময় পেত painting teacher-এর কাছে যেত তালিম নিতে। ওনার কাছে যাবার অবাধ অধিকার জন্মে গেছিল পাখীরার। ধীরে ধীরে পাখীরা canvas-এ painting করা শিখল। ওর তুলির টানে ছবিগুলো যেন মূর্ত্য হয়ে উঠত। পাখীরাও ধীরে ধীরে এই বাড়ির একটা অভিন্ন অঙ্গ হয়ে উঠল।

এরপরই এল সেই দিনটা, যে দিনটার স্বপ্ন হয়তো কোনো সময়ে দেখেছিল পাখীরা, ওর ছবি আঁকার স্বীকৃতি। এই দিনটার স্বপ্ন হয়তো ওর টিচারও দেখেছিল। চিত্রাঙ্কনের উপর যে তাঁর ভালোবাসা, সেটাই মূর্ত্য করার অভিলাষা তিনি তাঁর ছাত্রর মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন। এই দিনটা জিতুর কাছেও একটা আনন্দের দিন। সে ভালবাসত পাখীরাকে, যেদিন থেকে পাখীরা ওদের বাড়িতে এসেছিল, সেদিন থেকে সে জিতুর সর্বসময়ের সহচর হয়েছিল। মনে একটু ভয় ছিল, যে ওর বাবা-মা কখনই জানতে পারেনি। পাখীরা ছবি আঁকে। ওর ছবি নিয়ে ভালবাসা কুড়িয়ে ছিল জিতু নিজে। সেই গোপনীয় তথ্য এবার উন্মুক্ত হবে। তার প্রতিফলন নিয়েই সে চিন্তিত। এই চিন্তাটাই ভয়ের কারণ হয়ে আছে পাখীরার মনে।

জিতুর painting teacher অনেক পরিশ্রম করে 'Gandhi Art Theatre-এ পাখীরার ছবির একটা exhibition দিয়েছে। অনেক বড় বড় লোক আসবে । এনারা সকলেই শহরের গণ্যমান্য অতিথি। জিতুর Art Teacher ওঁদের স্কুলের Principalকেই প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওনার Art -School-এর ছাত্র-ছাত্রীরাই সমস্ত আয়োজনা করেছে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সুধাংশুবাবুর বাড়িতে সকাল থেকেই ব্যস্ততা। জিতুর Art Teacher নিজেই একদিন সুধাংশুবাবুর কাছে এসেছিলেন ওনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে। তিনি খুলে কিছু বলেননি, শুধু বলেছিলেন যে ওনার academi-র ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সুধাংশুবাবুর মনে এসেছিল ওনার ছেলের কথা, সেও তো ওনার ছাত্র। তাই সুধাংশুবাবুর যাবার ইচ্ছেটা ভালভাবেই প্রকাশ পেল। বাড়িতে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জিতুর উত্তরটা ছিল deplomatic, শুধু বলেছিল, যে সমস্ত ছবিগুলো জিতু বাড়িতে দেখিয়েছে তার মধ্য থেকেই কিছু ছবি থাকবে। জিতু শুধু বলেছিল যে পাখীরাকেও যেন নিয়ে যাওয়া হয়। ওর বাবা-মা দুজনেই রাজী হয়েছিল। সুতরাং পাখীরার জন্য ভাল জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা হল। জিতুরই একটা পরিষ্কার পাজামা আর কুর্ত্তা ওকে পরানো হল । নতুন সাজে বেশ ভালোই দেখাচ্ছিল পাখীরাকে। মনের মধ্যে একটা অজানা সংশয়। তাই নিজেকে সংবরণ করতে মোটামুটি চুপচাপ ছিল পাখীরা। সময়মত ওরা পৌঁছে গেল Gandhi Art Theatre-এ। ওদের অভিনন্দন জানাতে হাজির ছিলেন জিতুর Art Teacher। ওরা ওখানে পৌঁছাতেই জিতু আর পাখীরাকে ভিতরে নিয়ে গেল জিতুর Art School-এর বন্ধুরা। সুধাংশুবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ঘুরে ঘুরে Art Gallery দেখতে লাগলেন। অনেক ধরণের painting লাগানো আছে দেওয়ালে। এর মধ্যে দুটো ছবি চিনতে পারলেন সুধাংশুবাবু । তাঁর ছেলের painting book-এ দেখেছেন। শুধু নতুন করে caption দেওয়া আছে। গ্যালারী ঘুরে ঘুরে অনেক আঁকা ছবি দেখলেন। কোথাও বা স্কেচ, আবার কোথাও বা রঙিন তুলির টানে ফুটে উঠেছে সূর্যোদয়ের সকাল । অনেক দর্শকের ভীড়। একটা লম্বা হল ঘর, তার একটি কোণে রাখা আছে একটা Life size Painting, মনে হয় এই exhibition-এর এটাই প্রধান আকর্ষণ। কিছু দর্শক খুব খুঁটিয়ে সেই ছবিদেখছে Pastel colour-এ আঁকা সেই ছবি। একটি গ্রামের ছবি - গ্রামের মানুষ বিভিন্ন কাজে কর্মরত। জঙ্গলে ঘেরা সেই গ্রাম। লাল মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে জঙ্গলে। খুবই সুন্দর ছবিটি আঁকা হয়েছে - যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। জিতু, পাখীরা বোধহয় ওর painting teacher এর সাথেই আছে। হলঘরেরই মাঝখানে একটা মঞ্চ বানানো আছে। কিছুক্ষণ বাদে সেই মঞ্চে এক ঘোষক আসেন। তিনি উপস্থিত সকলকে auditorium-এ আসার অনুরোধ করলেন। উপস্থিত দর্শকরা সকলেই একে একে নিজ নিজ আসনে এসে বসল। সুধাংশুবাবু এবং তাঁর স্ত্রীও এসে বসলেন। শুরু

হল অনুষ্ঠান, জিতুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মঞ্চে এসে সকলকে স্বাগত জানিয়ে চিত্রাঙ্কন বিষয় নিয়ে কিছু বললেন। তারপরই তিনি বলতে শুরু করলেন সেদিনের সাজানো ছবিগুলোর বিষয়ে। খুব গর্বের সাথে বললেন 'এই ছবিগুলো খুব অল্পবয়সী ছাত্রের হাতেই তৈরি হয়েছে। এত ছোট বয়সে ছেলেটির চিন্তাধারার বৈশিষ্টতা যে কত প্রখর, তা মূর্ত্ত্য হয়েছে এই আঁকা ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে।' কথাগুলো শুনে সুধাংশুবাবুর মনে একটা শিহরণ এল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কি করে তার পুত্রের হাত এত সুন্দর হল। এত দামী রঙ পেলই সে কি করে? এই তুলির টান সে শিখল কতদিন ধরে? এ সব কিছুই তো সুধাংশু বাবু জানেনা। তবে জিতুর আঁকা স্কেচ বা কিছু রঙ পেন্সিলে আঁকা ছবি তিনি দেখেছেন। জিতুর প্রধান শিক্ষক এবার মঞ্চে ডেকে নিলেন জিতুর painting teacher-কে এবং তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে সগর্বে বললেন, 'ইনিই আমাদের স্কুলে ছবি আঁকার শিক্ষক। এনার নিজস্ব একটা Art Academy আছে। নতুন নতুন শিল্পী ইনিই তৈরি করেন, খুঁজে খুঁজে বের করেন তাঁর নতুন প্রতিভাদের। এই কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছে আমাদের স্কুল।'... সুধাংশুবাবু উন্মুখ হয়ে তাঁর কথা শুনছেন আর অপেক্ষা করছেন কখন তিনি ওই প্রতিভাকে মঞ্চে ডেকে আনবেন।... আর সেই প্রতিভা কি তাঁদের জিতু...?

এবার জিতুর প্রধান শিক্ষক বলে উঠলেন, আজকের সেই নতুন প্রতিভা একটি গরীব ছেলে... আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছে। তার অনুপ্রেরণা শুধু আমাদের চারপাশের মানুষ..... আর প্রকৃতির সাজানো সৃষ্টি। কিছুই ছিলনা তার সাথে... শুধু স্বপ্ন ছিল তার চোখে। সেই মনের আবেগে সে আঁকত pencil sketch। একদিন তার ছবির টান দেখে এগিয়ে আসেন আমাদের painting teacher. ছেলেটি আমাদের স্কুলের নয়। স্কুলে পড়ার ক্ষমতাই তার নেই, লোকের বাড়িতে আশ্রিত... কিন্তু জীবনটাকে তার তুলিতে ধরে রাখতে চায়।'... সমস্ত দর্শক উদগ্রীব সেই ছেলেটিকে দেখতে... জানতে। অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছেন সুধাংশুবাবু সেই ক্ষণটির জন্য। প্রধান শিক্ষক এবার বলে উঠলেন, 'এবার সেই ছেলেটিকে আমি মঞ্চে ডেকে নেব।' স্টেজের পিছন থেকে ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে এল একটি ভয়ে কুঁকরে যাওয়া ছেলে - পরণে পাজামা আর হাফসার্ট। চমকে দাঁড়িয়ে উঠলেন সুধাংশুবাবু। তিনি যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না, মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল - পাখীরা! ... হ্যাঁ ! প্রধান শিক্ষক সেই নামটিই পরিস্কার স্বরে বললেন, এই ছেলেটিই আজকের চিত্রকার... যার ছবি সকলে দেখেছেন..... নাম পাখীরা।... একটি আদিবাসী ঘরের ছেলে। ওর ভয়, ছবি আঁকার কথা স্বীকার করলে যদি ওর গৃহকর্তা জানতে পেরে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়... ওকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়.....। ওর লুকোনো শিল্পকলাকে জাগ্রত করেছে আমাদের স্কুলের Art Teacher। আর এই ব্যাপারে দিনের পর দিন সাহায্য করেছে আমাদের স্কুলের ছাত্র জিতেন্দ্র। ওনার কথা শেষ হল না, সমস্ত দর্শকের করতালিতে পুরো হলটা গমগম করে উঠল। সুধাংশুবাবুর চোখে তখন জল বিনা বাধায় নেমে আসছে। তিনিও করতালি দিচ্ছেন। মঞ্চে ভয়ার্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাখীরা হাতজোড় করে... যেন সকলের কাছে ক্ষমা চাইছে তার ধৃষ্টতার জন্য। পাখীরার চোখেও জল। কোন ফাঁকে জিতু দৌড়ে চলে এসেছে সুধাংশুবাবুর কাছে। অত কলরবের মধ্যেই বলে উঠল 'বাপী তুমি যাবে না ওর কাছে?' সুধাংশুবাবুর চোখে জলের ধারা। আজ তো লুকোবার কিছু নেই। তার ছেলে জিতুই তো পাখীরাকে এই আসনে বসিয়েছে, তিনি মাথা নেড়ে বলেন 'হ্যাঁ... হ্যাঁ... আমি যাব .....নিশ্চয়ই যাব। পাখীরাও তো আমার ছেলে? আমিই তো ওকে নিয়ে এসেছি... পালন করেছি। নিজের আসন ছেড়ে তিনি এগিয়ে যান সামনের দিকে। প্রধান শিক্ষকের ঘোষণা আবার ভেসে ওঠে 'পাখীরার মত ছেলের সুন্দর কাজকে মান্যতা দিতে আমাদের স্কুল কমিটি ওর আঁকা ওই pastel চিত্রটি কিনে নিয়েছে দশ হাজার টাকা মূল্যে, পাখীরা সম্মতি জানিয়েছে। ছেলেটিকে আমাদের ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আরও দশহাজার টাকা এবং ওর Art Teacher-এর Academy-র সব ছাত্রছাত্রীরা মিলে আরও পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে। সব মিলিয়ে এই পঁচিশ হাজার টাকার চেকটি আমি ওর বাবার হাতে তুলে দিতে চাই। সুধাংশুবাবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি বুঝতে পারছেন না ওর বাবা এসেছে কিনা। পাশ থেকে তার পুত্র জিতু ওনার হাত ধরে টেনে বলল, 'যাও না বাপী তোমায় ডাকছে!'

মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা ওর Art Teacher ওঁদের দেখতে পেয়েছেন । পাখীরাও দেখেছে ওর বাবাকে। ওর মনে এখনও ভয়.... কি জানি বাবা ওকে বকবে কিনা, ও তো মিথ্যা কথা বলেছে - নিজের আঁকা ছবিকে জিতুর ছবি বলে। ততক্ষণে আর্ট টিচার সুধাংশুবাবুকে ডেকে মঞ্চে তুলে নিলেন। নিজের ভাবাবেগকে আর সামলে রাখতে পারলেন না সুধাংশুবাবু। নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন পাখীরাকে। অস্পষ্ট স্বরে বেরিয়ে এল পাখীরা..... তুইও তো আমার ! আমি এতদিন জানতে পারিনি। সমস্ত হলটা জুড়ে করতালি বেজে উঠল। পাখীরা এতদিন যেন একটা বিরাট নিরাপত্তার মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিল । এটাই তো জীবনের একটা সদর্থক সত্যি ঘটনা হয়ে রয়ে গেল। এটাইতো চেয়েছিল পাখীরা .....ওর ছবি আঁকার স্বীকৃতি।

স্মৃতির আলোয়

সমীর ঘোষ

নয়ডায় আসার পর যে সমস্ত লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় ও পরে যাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, উঠাবসা করা হত তাদের মধ্যে কেউ চলে গেলে মনটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে উঠে। নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ও আমাদের বন্ধু শ্রী আশিষ রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী দীপক কুমার দত্ত আজ আমাদের মধ্যে নেই - এই কথা আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু সবই ভগবানের ইচ্ছা। আমাদের তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিতে হয় আমরা উভয়ের আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রী আশিষ মুখোপাধ্যায় প্রায় তিন দশক ধরে নয়ডার বাসিন্দা ছিল। তার সাবলিল ব্যবহার ও বন্ধুসম আচরণ সকলকে আকৃষ্ট করত। আশিষ আমাদের সংগঠন প্রযোজিত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করত। নাটক ও গীতিনাট্যের কলাকুশলীদের পোষাক ও সাজসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব শ্রী মুখোপাধ্যায়ের উপরই দেওয়া হত।

বলাবাহুল্য, ১৯৮৪ সনে এসোসিয়েশানের প্রথম পাঠাগারের (লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠা হয় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে। সে পাঠাগারকে সুচারু ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করত।

সেই বছর বর্ষামঙ্গল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও তারই বাসভবনে আয়োজিত হয়।

আজও মুখোপাধ্যায়ের কথা আমাদের মনে পড়ে।

এসোসিয়েশন গঠন হবার কিছুদিন পর শ্রী দীপককুমার দত্ত নয়ডায় আসে ও সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে।

প্রথম কিছু বছর শ্রী দত্ত এসোসিয়েশনের কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না। ১৯৯৭-৯৮ থেকে উনি এসোসিয়েশনের কার্যকলাপে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন ও অনেক গঠনমূলক কাজে সাহায্য করেন । ১৯৯৯ সালে শ্রী দীপক দত্ত নয়ডা দুর্গাপূজা সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। তার নেতৃত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই বছর দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। নয়ডাবাসিরা দুর্গাপূজার ব্যবস্থা ও আয়োজনের খুবই প্রশংসা করে।

তার দক্ষতা ও নিষ্ঠা দেখে সংগঠন ২০০৬ সনে শ্রীদত্তকে এসোসিয়েশনের সাধারণ সচীব পদে নিযুক্ত করে ২০০৬-২০০৮ পর্যন্ত শ্রীদত্ত সাধারণ সচীব পদে থাকাকালীন এসোসিয়েশনের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলা ছিল তার একমাত্র মূলমন্ত্র।

আজ শ্রীদত্ত আমাদের মধ্যে নেই মনে করলে খুবই দুঃখ হয়। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠার কথা আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না।

নয়ডা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে বাসন্তী পূজো

বাসন্তী পূজোর অষ্টমীতে কুমারী পূজো

সংঘমিত্রা সব্যসাচী উপাখ্যান

নন্দিতা রায়
সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, উ.প্র.

ইস্ ফুরিয়ে গেল। সবেমাত্র দেখতে শুরু করেছিলেন স্বপ্নটা...। অনেক দিন আগেকার একটা স্মৃতি মনের পর্দায় কেন যে ভেসে আসছে বার বার... সংঘমিত্রা একদিন জোরকরে একটা গানের আসরে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। না যেতে চাইলেও যেতেই হয়েছিল। আসরে সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত। গায়ক ছিলেন সার্বর্ণ দত্ত। 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি / আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।'

সেইগান সেদিন সব্যসাচীর চেতনাকে ভেঙে চুরে একটা বর্ণনাহীন উপলব্ধির সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। আজ চকিতে সে অনুভূতিটা আবার ফিরে এসেছে। একা চায়ের কাপ নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন সব্যসাচী। গজু আজ না বলতেই আর এক কাপ গরম চা নিয়ে এল।

এই গজুটা আজ কুড়ি বছর ধরে তাঁর সঙ্গী। টিমারপুরে একটা চায়ের দোকানে কাজ করত। ওর বয়স তখন সাত কি আট। বাপ-মা মরা ছেলেটা দিল্লির প্রচণ্ড শীতে, গায়ে একটা সোয়েটার পর্যন্ত নেই, খালি পায়ে, গরম চা এনে দিত সব্যসাচীকে।সেখান থেকেই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন সব্যসাচী। এখন ঘরের সব দায়িত্বই গজুর। স্কুলে ভর্তি হয়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশুনোও করেছে সে। গজু ছাড়া সব্যসাচীর ঘর সংসার অচল। কারো গেটখোলার শব্দে সব্যসাচীর অন্যমনস্কতা ভাঙে।

'সব্যসাচীদা, কেমন আছেন? আমি পুলক।'

'হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম, কিন্তু কী ব্যাপার? পথ ভুলে নাকি?'

সব্যসাচীর কথায় পুলক একটু অপ্রস্তুত হলো, 'আজকাল এক্কেবারে সময়ই পাই না। সকালে ছেলেকে স্কুলে ছাড়ি, বউ যায় কাজে, কোন রকমে দুটো নাকে মুখে গুঁজে চাটার্ড বাস। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে বাজারে যাওয়ার হ্যাপা।

'এমন তো প্রায় সবারই। তাই বলে কি কেউ বেরুবে না, কারো খোঁজ খবর নেবে না? সব বন্ধ করে দিতে হবে? যাকগে ছাড়ো ওসব। গল্প, কবিতা লেখা কেমন চলছে? নতুন কী লিখলে টিখলে তাই বল।' সব্যসাচী একটু নড়ে চড়ে বসে গজুকে বললেন, চা আর বিস্কুট আনতে।

পুলকও বেশ আরাম করে বসতে বসতে বলল, 'না—না, তা-কেন? 'আপনি শ্রদ্ধেয় গুরুজন, আপনার সাথে দেখা করা বা খোঁজ খবর নেয়াটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সময়ের অভাবটাই বড় বাধা। আজ ছুটি আছে তাই একটু সময় পেলাম। আর কবিতার কথা? সে যে কোথায় রেখেছি পাতাগুলোই খুঁজে পাচ্ছি না। অফিসের যা খাটুনি বড় কর্তাদের মন জোগাতে জোগাতেই দিন কাবার।'

সব্যসাচী নিজেও কবিতা লেখেন এবং ভালবাসেন কবিতাকে। কবিতা শৈলীর ওপর তাঁর যত জ্ঞান, অন্ততঃ বর্তমান যুগের কবিদের কারোরই নেই বললেই চলে। আজকাল যেসব কবিতা লেখা হয়, তাতে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

'সেদিন হ্যাবিট্যাট সেন্টারে কাব্যসন্ধ্যা হল, সেখানে তোমাকে দেখব ভেবেছিলাম। যাওনি তো?' সব্যসাচী একটুখানি অন্য মনস্কতার পর সরাসরি পুলকের দিকে তাকালেন।

'যাওয়ার কথা ছিল, কোন কাজে আটকে গিয়ে যাওয়া হল না।'

'আরে, কাজে আটকে গিয়ে যাওয়া হল না, এটা কি কোন কথা? এমন বাধা তো সব সময়েই আসবে তাই বলে তোমার কবিতা, আর্টিস্ট হিসাবে তোমার বৈশিষ্ট্য, সব বিসর্জন দেবে নাকি?' সব্যসাচী হঠাৎ যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

পুলক ধুতি পাঞ্জাবী পরে তাঁর সামনে বসে আছে। তাঁদের সময়ে সামাজিক কোন উৎসব বা কালীবাড়ির পূজা পার্বণে দুর্গাপূজা উৎসবে প্রতিটি বাঙালি ধুতি পাঞ্জাবী পরে আসতেন, গর্ব করে বলতেন, এটা আমাদের ঐতিহ্য।

সব্যসাচীকে ধুতির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পুলক বলল, 'ধুতি পরা ব্যাপারটা কিন্তু বেশ কঠিন, কাছা বড় করতে গেলে কোঁচা ছোট হয়, কোঁচা বাড়াতে গেলে পায়ে টান পড়ে। কী সুন্দর মাল কোঁচা মেরে ধুতি পরেন আপনি।' 'শাঁখা-সিঁদুর ধুতি-পাঞ্জাবী, দুর্গাপূজা ভাইফোঁটা - এই সব প্রাত্যহিক জীবনাচরণের মধ্যে দিয়েই তো বাঙালি বেঁচে থাকবে চিরকাল।' একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন সব্যসাচী। মায়ের একটা ছবি এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে গা ধুয়ে পায়ে আলতা পরতো মা। সেই ফুটফুটে পা দুখানিতে কী যে শ্রী ছিল।

তাঁর জন্ম পূর্ব বাংলায়। ছোট বেলাও কেটেছে ওখানে। লেখাপড়া করেছেন কলকাতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন কিছুদিন। একটা সময় ছিল, যখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বাঙালিদেরই প্রাধান্য ছিল সর্বত্র। দিল্লিও ব্যতিক্রম ছিল না এই নিয়মের।

বাঙালি হিসেবে প্রথম প্রথম দিল্লীবাসের সবচেয়ে গভীর অভাব বোধ হয় এই আড্ডাহীনতা। দিল্লিওয়ালারা আবার আড্ডার নাম শোনেনি আড্ডা দেওয়া তো দূরের কথা।

'পুজো আসছে ভাবতে ভাবতে পুজো এসে চলেও গেল। এখন দীপাবলী গেলেই তো শীত পড়া শুরু হয়ে যায়। বলতে বলতে পুলক উঠে দাঁড়ায়।

'আজকাল তো শুনি গানের বাজারও মন্দা। যেমন তার কথা তেমনি তার সুর। সবচেয়ে বড় কথা নীরস গাওয়া। এককালে আমিও কিছু গীত রচনা করেছি। তখন তো আমরা প্রথম লক্ষ্য রাখতাম কাব্যগুণের প্রতি। যে কোনও গান প্রথমে হতে হবে কাব্যরসান্বিত। ভাবে ভাষায়, কথায় ছন্দের সমন্বয়। তারপর সুর...' পুলককে এগিয়ে দিতে সব্যসাচীও উঠে পড়লেন।

পুলক চলে যেতেই সব্যসাচীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অজান্তেই। এককালে কাজ করে সুখ ছিল তাঁর কাছে। খাটুনিকে আর খাটুনি মনে হত না। 'পার্থসারথি' পত্রিকায় গল্প উপন্যাস দেখতেন — রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি পড়তেন, কাটা কুটি করে প্রেসে পাঠাতেন। বাকি সময় ডুবে থাকতেন নিজের লেখার মধ্যে। কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে দিল্লি, বদলে যাচ্ছে নিজের জীবন। বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। নিজের বিরল কেশ টাক মাথায় হাত বুলিয়ে নিলেন খানিকটা। সেদিনের সেই সুদর্শন যুবক আজ এই টাক মাথা বুড়ো। তাড়াতাড়ি হাঁটতে কষ্ট হয়। হার্টেরও সামান্য গোলযোগ আছে। কবে যেন হঠাৎ নজরে পড়ল শিবাজী প্লেস আর নেই। সে এখন বিভিন্ন গাড়ীর পার্কিং প্লেস আর সাধারণের টয়লেট।

স্নান খাওয়া সেরে নিজের ঘরে গেলেন সব্যসাচী। আজ আর রোদ উঠবে না। মেঘ করেছে। বুড়ো বয়সে কথা বেশি বলতে ইচ্ছে করে, অথচ কথা বলার লোকই কম হয়ে গেছে। একাকীত্ব আজকাল বড় অসহ্য লাগে। এমন সময়ে একজন কারও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে তাঁর।

ঘুম না পেলেও বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই আধো ঘুম আধো জাগরণের সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল আবার। স্বপ্নটার কোন মানে তিনি খুঁজে পেলেন না, তবে এটাই স্পষ্ট বুঝলেন সংঘমিত্রা এখনও তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বাইরের দিকে দেখলেন সব্যসাচী। কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো ঝিলমিল করে কাঁপছে হাওয়ায়। থেকে থেকে কি যেন একটা পাখির ডাক। সব কিছু বড় বিষণ্ণ আর উদাসীন লাগে এই মুহূর্তে। মনে হল, আজ একবার বাগানটা দেখতে যাবেন, গজুকে নিয়ে। কুতব মিনার যেখানে, সেই মেহেরোলি গ্রাম ছিল দিল্লীর বাইরের এলাকা। তখন কুতুব দিল্লীতে হয়েও দূর পারের ব্যাপার ছিল। বাগানের শখেই এখানকার জমিটুকু কিনেছিলেন। এখন আবার সেটা ফার্ম হাউস। তাঁর ইচ্ছে ছিল — ফল ফুলে ভরা বাগান হবে। কোন ভিড় থাকবে না, চারদিকে শুধু সবুজ — গাছ গাছালি আর নির্জনতার মাঝখানে প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় পাখিদের গান, ফুলের গন্ধ নিয়েই কাটবে তাঁর একাকীত্ব।

পঁচিশ বছর আগে কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল, কুতবের রাস্তাটির নাম হবে শ্রী অরবিন্দ মার্গ। খুব চওড়া মসৃন রাস্তা। পনেরো মিনিটেই গাড়িতে কুতব পৌঁছে যাওয়া যায়। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফিয়াট গাড়ি আছে তাঁর। দরকার পড়লে গজুই চালিয়ে নিয়ে যায়। গজুকে বলেই দিয়েছেন, 'তোর ভবিষ্যৎ দেখব আমি, আমার যা কিছু আছে, তুইও তার একজন মালিক।'

চোখ দুটো বুজে আসে তাঁর। সেই গানের সুর... সংঘমিত্রা... শরীর জুড়ে ঝিম ঝিম করে বেজে চলেছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে এসেছেন ডঃ সব্যসাচী বসু।

এম.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল সংঘমিত্রা। ছিপছিপে লম্বা শরীর, সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্মা, চোখ দুটি জল বিন্দুর মত ঝলমলে। সব্যসাচী শুধু এম.এ.পি এইচ.ডি-ধারী নাম জাদা প্রফেসরই নন, ছিলেন সুদেহী, স্বাস্থ্যবান। অল্প বয়সী যে কোন কুমারীর কাম্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন তিনি। সব্যসাচী লাইব্রেরীতে বসেছিলেন — 'আপনার লেখা পড়লাম স্যার। খুব ভালো লাগল। 'আমার লেখা?' 'হ্যাঁ — কলেজ ম্যাগাজিনে।'

সংঘমিত্রার খোলা মেলা হাসি সারা মুখে বিদ্যুতের ঝিলিক ছড়িয়ে দিল। ছোট্ট উচ্চারণে একটু মৃদু হেসে তিনি বলেন, 'ধন্যবাদ'।

'আপনি তো ইংরেজি পড়ান' সঞ্চয়িতা বলে।

'হুঁ'।

'তবে ধন্যবাদ দিলেন যে?'

'কেন, দোষ হল?'

'না', সংঘমিত্রা বলে, এখানে সবাই থ্যাংক্স বলেন।'

সব্যসাচী আর সংঘমিত্রা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠেছিল। সংঘমিত্রার কথার ভঙ্গিতে মজা উপলব্ধি করে সব্যসাচী ভিতরে ভিতরে নিজেকে ফিরে পায়, সহজ বোধ করে। সে এবার সংঘমিত্রার দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বলে, 'তোমার কোন ইয়ার?'

— ফার্স্ট।

সেদিন আলাপটা ওখানেই মেটে। সংঘমিত্রা চলে গেলে কয়েক মুহূর্ত কেন যেন অবশ হয়ে বসে রইলেন সব্যসাচী। সব্যসাচীর মন ছেয়ে যায় সংঘমিত্রার ছায়ায়। সেই থেকে দেখা প্রায় রোজই হত। একটু হাসি, অভিবাদন, এছাড়া আর কিছু নয়। প্রথম

প্রথম সব্যসাচীর ব্যাপারটায় কোন অসুবিধে হয়নি, কিন্তু ধীরে ধীরে সংঘমিত্রার চাউনি কিংবা ছোট্টো 'ভালো তো?' তাকে কিছুক্ষণ আনমনা করে রাখতো।

এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। কত মেয়ের সঙ্গেই তো মেলামেশা করে সে। ভারী সুন্দর গান গাইত সংঘমিত্রা।... একদিন সংঘমিত্রা বলল, 'আমার বাবা বদলী হয়ে দিল্লি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।' দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে চকিতে এই অনুভূতিটা আবার কেন ফিরে এল? খবরের কাগজটা খুলে টিভির সামনে বসলেন সব্যসাচী। খবরের কাগজ আবার ভাঁজ করে রেখে দিয়ে টিভি বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বুঝতে পারলেন দোষটা খবরের কাগজ বা টিভির নয়। তার মন যে কোথায়ও যাচ্ছে না তার কারণ একটা চাপা উদ্বেগ। এই কারণেই বোধহয় মা বলেছিল, বিয়ে না করে চিরজীবন একা থাকা যায় না, পরে পস্তাবি। কিন্তু তখন তাঁর সারা মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে সংঘমিত্রা।

মনে আছে, আঠারো বছর বয়সে 'শেষের কবিতা' পড়ে শুভেন্দু তিনদিন ঝিম মেরে ছিলেন। লাবণ্য না অমিত কাকে ভালবাসবেন। অমিত হতে চাইলেও লাবণ্য টানতো বড়। মনে হত বকুল বিছানো পথে লাবণ্যরা উদাসী বিকেলে অমন অবলীলায় চলে যায়।

'মামা তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে? তোমার গলা ভারি লাগছে কেন? আমাকে আগে ডাকোনি, আমি আগেই চা করে দিতাম।' গজু জানতে চায়। চা-বিস্কুট খেয়ে সব্যসাচী গজুকে বললেন, 'বাইরে কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, কে কথা বলছিল তোর সাথে?'

'ওই রাম আগরওয়ালের জমিজমা যে দেখা শোনা করে সে বলছিল, সব্যসাচীবাবু শাগ উগিয়ে শুধু শুধু জমিটা নষ্ট করছেন। বাগান বাড়িটা বেচে দিলেই তো হয়।' আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ভেবে চলে গেল। একটু পরে আবার আসবে?' মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এর আগেও একজন বলেছিল, আপনি একা মানুষ, দেখা শোনা করাও তো অসুবিধে। বিক্রির কথা মনে থাকলে আমাকে বলবেন।

সব জায়গায় দালাল। দিনকাল যে কোথায় এসে পৌঁছেছে।

গজুকে নিয়ে মেহেরোলির বাগান জমিটায় পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গেল। গাড়িটা পার্ক করে একটু হাঁটতেই যতদূর দেখা যায় শুধুই সবুজ আর সবুজ। দু-পা এগিয়েই ধাপ ধাপ আলুর চারা মাথা তুলেছে। হাওয়ায় দুলছে ছোট ছোট গাছগুলো। সব্যসাচী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন এই ঢেউ তোলা কচি কচি গাছগুলোর দিকে। পবন ঝোলা ভরে তরি-তরকারী তুলে দিল গাড়িতে।

ওরে পবন, তুই বাগানটাকে এত ভালবাসিস বলেই তো আমি এমন ঝোলা ভরা তরিতরকারি পাই। জেনে রাখ তোর সারা জীবনের খাওয়া পরার ব্যবস্থা আমি করেই যাব' সব্যসাচীর কথা শুনে পবন মালী খুশিতে গদ গদ হয়ে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

'মামা, আজ তোমাকে আলু পোস্ত আর কুমড়ো ঝিঙের নারকেল দেওয়া তরকারি করে খাওয়াব।' গজু গাড়িতে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত দেয়। 'তুই ঠিক মত দেখে শুনে গাড়ি চালা, আলু পোস্ত পরে হবে।

সব্যসাচীর মনে হল, তাঁদের আমলের লোকগুলোও যেন এখন কার মানুষ গুলোর থেকে বেশি ভদ্রলোক ছিল। বিনয়ী, কথা শুনত। মাথা উঁচিয়ে চোখ রাঙিয়ে, গলা বাজিয়ে কথা বলত না। বাগান বিক্রির কথায় তাঁর মেজাজ খিঁচড়েই আছে। একজন বাঙালির কিছু ভাল হলে, অন্য বাঙালিরা মুষড়ে পড়ে। অন্য বাঙালিদের ঘুম চলে যায়। কতক্ষণে একজনকে আরো নিচে নামিয়ে দেবে সব সময়ে একই চিন্তা কেন যে কাঁকড়া প্রবৃত্তির হয়ে উঠলো বাঙালিরা।

সকাল বেলায় সম্বুদ্ধ এল, সঙ্গে কমল। 'সব্যসাচীদা, আজ 'ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টারে যাচ্ছেন তো? আমরাও কয়েকজন যাব ভেবেছি কবিতা পড়তে। প্রধান অতিথি তো আপনাকেই করেছে। কার্ডে দেখলাম।

'হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে তিন জন মহিলা কবি এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের একটি 'কবিতা সংগ্রহ'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।' সব্যসাচী, কমল আর সম্বুদ্ধকে বসতে বললেন।

'আমি কমল, সম্বুদ্ধর সাথে আসা ছেলেটি হাতজোড় করে নমস্কার জানাল।'!

'সব্যসাচীদা, কমল কিন্তু দারুণ গায়। ওর ভজন না শুনলে ওকে যাচাই করা যায় না।' সম্বুদ্ধ উচ্চ্বসিত হয়ে উঠলো কমলের প্রশংসায়।

চা জল খাবারের পরে গজুকে হারমোনিয়ামটা বার করে দিতে বললেন সব্যসাচী।

'ঠুমক চলত রামচন্দ্র.. বাজত' কমল ভজন শুরু করল। গভীর আনন্দে চোখ বুজলেন সব্যসাচী। গান এমনই তো হওয়া চাই। সব্যসাচী খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন। শিউলির গলা বাড়ানো ডালপালা শেষবেলায় যত পারে ফুল লুটিয়ে দিচ্ছে মাটিতে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছলেন সব্যসাচী। সভাপতির ভাষণের পরেই প্রধান অতিথি সব্যসাচী কাব্যগ্রন্থটি

উন্মোচন করবেন। লেখিকা কবি ডঃ সংঘমিত্রা — আমেরিকাবাসিনী।

সব্যসাচীর চোখে পড়ল হাল্কা বাদামী রংয়ের শাড়ি পরা মহিলাটির দিকে। সামনেই বসেছেন তিনি। বুকের রক্ত ছলাত করে উঠলো সব্যসাচীর। চল্লিশ বছর পরও ভুল হবার কথা নয়। চিবুকের কাটা দাগটি স্পষ্ট। রূপোলী চুলের লম্বা বিনুনী। মুখে বয়সের ছাপ। শরীর খানিকটা ভারী ... সংঘমিত্রা...! ... এত বছর পর! উঠে দাঁড়ালেন সব্যসাচী। বার্ধক্যের যে একটা আলাদা সৌন্দর্য্য থাকে সব্যসাচী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাব্যগ্রন্থের উন্মোচন করে পাতা উল্টেই চমকে উঠলেন তিনি। — গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত — 'সব্যসাচী বসু প্রিয়বরেষু।'

এগিয়ে এল সংঘমিত্রা। মৃদু হাসলেন সব্যসাচী। 'চিনলে?' আশে পাশের লোক লজ্জার কোন বাধাই রোধ করতে পারলো না সংঘমিত্রার আবেগ। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সত্তরোর্দ্ধ সব্যসাচী বসুকে।

'চিনবো না?' চল্লিশ বছর হল তাই না? চল্লিশ বছরের সব কথা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই না'... না... না... ডঃ সব্যসাচী বসুর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সংঘমিত্রা...

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত মনে জানাই যে আমাদের অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য এবং নয়ডা দুর্গাপূজা সমিতি কালীবাড়ীর বিগত বছরের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আশীষ ভট্টাচার্য্যর পিতা গত ২রা এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আশীষ ভট্টাচার্য্য ও তাঁর পরিবারকে এই দুঃসময়ে আমাদের সমবেদনা জানাই।

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ সুতপা মজুমদার
গোত্র ঃ কাশ্যপ, গণ ঃ দেবগণ
উচ্চতা ঃ 5 ফুট 2 ইঞ্চি, বয়স ঃ 35 বছর
শিক্ষা ঃ M.Sc. Physics
Classical সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী বর্তমানে নয়ডা MNC কোম্পানীতে কর্মরতা
মাতা ঃ অবসরপ্রাপ্ত Principal of Shyma Prasad SecondarySchool, Lodhi Road, Delhi
পিতা ঃ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
উপযুক্ত পাত্র চাই
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
মি. পি.বি. মজুমদার, সি-361, সেক্টর-পি 3, গ্রেটার নয়ডা, নয়ডা । ফোন ঃ 8800684209, 8447191974

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ অঙ্কিতা দে
বয়স ঃ 28 বছর
দেবারি গণ - কাশ্যপ গোত্র
শিক্ষা ঃ B.Sc. (IT), Diploma in Software Technology
পেশা ঃ Computer Teacher (Children Academy)
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ মিঃ পি. কে. দে
এ-268, সেক্টর-9, নিউ বিনয় নগর, গাজিয়াবাদ
ফোন ঃ 9873448975, 9350378838

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখাপাঠান:

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ই৫ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.